ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত
‘নাওয়াকিদুল ইসলাম’ গ্রন্থের ব্যাখ্যা

ঈমান ধ্বংসের কারণ

ব্যাখ্যাকারক
শাইখ আবদুল আযীয তারীফি

অনুবাদক
নাজমুল হক সাকিব

সম্পাদক
আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সত্যায়ন
প্রকাশন

সত্যায়ন
প্রকাশন

ঈমান ধ্বংসের কারণ

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০২০

ISBN : 978-984-8041-76-5

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২০

প্রচ্ছদ : শরিফুল আলম

পৃষ্ঠাসজ্জা : আবদুল্লাহ আল মারুফ

অনলাইন পরিবেশক :
ওয়াফি লাইফ, রকমারি.কম, আলাদাবই.কম

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ১৯২ টাকা

সত্যায়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০
+৮৮ ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৪
facebook.com/ sottayonprokashon

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ৭

ভূমিকা ৯

শুরুর কথা ১২

ঈমান ভঙ্গের প্রথম কারণ : আল্লাহর সাথে শিরক করা ১৬

বড় শিরকের প্রকারভেদ ২১

১. দুআর শিরক ২২

২. নিয়তের শিরক ২৪

৩. আনুগত্যের শিরক ২৫

৪. ভালোবাসার শিরক ২৯

ছোট শিরকের প্রকারভেদ ৩৬

১. প্রকাশিত শিরক ৩৬

২. গোপন শিরক ৩৮

ঈমান ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ :
আল্লাহ ও তাঁর মধ্যে কোনো কিছুর মাধ্যম সাব্যস্ত করা ৪৪

ঈমান ভঙ্গের তৃতীয় কারণ : কাফিরকে কাফির না বলা ৫১

ঈমান ভঙ্গের চতুর্থ কারণ :
নবিজির আদর্শ ছাড়া
অন্য কোনো আদর্শকে সুন্দর বা পরিপূর্ণ মনে করা ৫৭

ঈমান ভঙ্গের পঞ্চম কারণ :
আমল করা সত্ত্বেও শারীআতের কোনো একটি বিষয়কে অপছন্দ করা ... ৬৬

ঈমান ভঙ্গের ষষ্ঠ কারণ : দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে উপহাস করা ৭১

ঈমান ভঙ্গের সপ্তম কারণ : জাদু করা ৮০

ঈমান ভঙ্গের অষ্টম কারণ :
মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য সহায়তা করা ৮৮

ঈমান ভঙ্গের নবম কারণ :
এই ধরনের বিশ্বাস রাখা যে, কিছু মানুষের জন্য
মুহাম্মাদ ﷺ-এর শারীআত থেকে বের হয়ে যাওয়া বৈধ ১০৩

ঈমান ভঙ্গের দশম কারণ : আল্লাহর দ্বীনকে উপেক্ষা করা ১০৯

পরিশিষ্ট ১১৬

অনুবাদকের কথা

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। মানব-জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র মুক্তির পয়গাম। তাই এই দ্বীনের মধ্যে কোনো সংশয় নেই। কোনো অস্পষ্টতা নেই। ইসলামের বিশ্বাস ও চেতনা স্বচ্ছ। আদর্শ ও নীতি নির্মল। মুসলিমদের বিশ্বাসে কোনো গোঁজামিল নেই। কোনো দ্ব্যর্থতা নেই। তাই একজন প্রকৃত মুসলিম তার বিশ্বাস নিয়ে কোনো সংশয়ে থাকে না। আপন বিশ্বাস নিয়ে তার কোনো দুর্বলতা নেই। কোনো লুকোচুরি নেই। কার বিরুদ্ধে গেল, কার গায়ে লাগল, কে কী বলল, কে কী মনে করল এসব নিয়ে তার পরোয়া নেই। সে তার বিশ্বাসে অবিচল। তার আদর্শে অটল। কালের কোনো ঝাপটা তাকে তার বিশ্বাস থেকে একবিন্দুও টলাতে পারবে না। এটাই তার দৃঢ়তা। এরই নাম 'ইস্তিকামাত'।

ইসলামের বিশ্বাস ও চেতনা নিয়ে আজকাল সর্বমুখী ষড়যন্ত্র চলছে। আল্লাহ-প্রদত্ত ঐশী এই বিশ্বাসকে অযৌক্তিক, অনৈতিক, অমানবিক, অসাড়, সেকেলে, সম্প্রদায়িক ইত্যাদি আখ্যা দেওয়ার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ পরিস্থিতিতে একজন সাধারণ মুসলিমের পক্ষে তার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও আস্থাশীল থাকা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে এমন অনেকেই আজকাল জানে না যে, কোন বিশ্বাসটি তার মুসলিম-পরিচয়ের সাথে সাংঘর্ষিক। নিজেকে মুসলিম জাতিসত্তার একজন সদস্য বলে পরিচয় দিতে হলে কী কী বিশ্বাস লালন করতে হয় এবং কী কী বিশ্বাস বর্জন করতে হয় অধিকাংশ মুসলিমই তা সম্পর্কে

বেখবর। সেই উপলব্ধি থেকেই আমরা বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছি। বক্ষমান গ্রন্থটি আরব-বিশ্বের তাওহীদবাদী আন্দোলনের পুরোধা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত *'নাওয়াকিদুল ইসলাম'* গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। মূল নাম *'আল-ই'লাম বিতাওযীহি নাওয়াকিদিল ইসলাম'*। ব্যাখ্যাকার শাইখ আবদুল আযীয ইবনু মারযুক তারীফি আরব-বিশ্বে একজন তাওহীদবাদী আলিম হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাঁর এই গ্রন্থে তিনি ঈমান বিনষ্টকারী দশটি বিষয় নিয়ে বাস্তবমুখী তথ্যনির্ভর আলোচনা করেছেন। একজন মুসলিমের জন্য এ বিষয়গুলো আত্মস্থ করা অত্যন্ত জরুরি।

'নস'-ভিত্তিক এই গ্রন্থটিকে আমি যথাসম্ভব মূলানুগ অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। লেখকের মূল তত্ত্বকে পাঠকের বোধগম্য করার স্বার্থে কখনও কখনও আমাকে বিশ্লেষণমূলক অনুবাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে। আয়াত ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি নিজস্বধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া হাদীসের তাহকীক ও তাখরীজের কাজটিও আমাকে কাঁচাহাতে করতে হয়েছে। সর্বশেষ মানবীয় সকল ত্রুটি ও বিচ্যুতি থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি। তিনি বইটিকে সর্বসাধারণের জন্য উপকারী হিসেবে কবুল করুন। আমাদের সকল শ্রমকে তিনি আপন সন্তুষ্টির তরে গ্রহণ করে নিন। আমীন।

নাজমুল হক সাকিব
৭/৮/২০২০ ঈসায়ি

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমি তাঁর যথাযথ প্রশংসা করছি। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর নবি ও বান্দা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের উপর।

মানব-জাতির উপর আল্লাহ তাঁর শারীআর অনুকরণ ও তাঁর নবির অনুসরণ আবশ্যক করে দিয়েছেন। এটি এমন পথ যার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। মানব-জাতির জন্য তা অন্ধকারে আলোর দিশা, আত্মার খোরাক ও হৃদয়ের প্রাণশক্তি। এই পথকে যে আঁকড়ে ধরবে সে মুক্তি পাবে। আর যে বিচ্যুত হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

যারা এই জীবন-বিধানের বিরোধিতা করে তারা অন্ধ। তাদের হৃদয়গুলো মৃত। তারা এমন বস্তুর পেছনের অংশ ধরে বসে আছে যার কোনো অগ্রভাগ নেই। এমন সব চেতনা তারা লালন করে যেগুলোর প্রণেতাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। সেগুলো নিক্ষেপিত হয়েছে সময়ের আঁস্তাকুড়ে। ওসব নিয়ে মাতামাতি করে তারা ইসলামি শারীআর এমন সব বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, যা পৃথিবীর বুকে ততদিন অবস্থান করবে যতদিন আসমান ও জমিন বিদ্যমান থাকবে।

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত *'নাওয়াকিদুল ইসলাম'* গ্রন্থের উপর আমি দারস প্রদান করেছিলাম। বক্ষ্যমান বইটি সেই দারসেরই লিখিত রূপ। বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

উপলব্ধি করে কিছু ভাই এটিকে বই আকারে বের করতে আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন। ফলে আমি সেই পাণ্ডুলিপিতে সামান্য কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছি। প্রয়োজনীয় কিছু সংযোজন-বিয়োজনও করেছি।

এই বইয়ে যে মূলনীতিগুলো উল্লেখিত হয়েছে তা দ্বীন (ইসলাম) ও মিল্লাতু (ইবরাহীমের) স্তম্ভ। এগুলো বর্ণনা করার জন্যই আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জিন-জাতির প্রতি তাঁর রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি ওহি অবতীর্ণ করেছেন এবং মানব-জাতিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি জবান ও তরবারি দ্বারা এগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

> ‘আমি জিন ও মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।’[১]

ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা (এই আয়াতের ব্যাখ্যায়) বলেন, ‘(আমি এই জন্যই মানুষ ও জিন সৃষ্টি করেছি) যাতে তারা আমার দাসত্ব স্বীকার করে নেয় স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়।’[২]

দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই বঞ্চিত সমসাময়িক কিছু লোক দ্বীনের এই মূলনীতিগুলো বিনষ্ট করতে চায়। তাদের এই দূরভিসন্ধির কথা কখনও তারা প্রকাশ্যে বলে। কখনও বা মিষ্টি কথার আড়ালে তারা নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যস্ত থাকে। ওদিকে সময়ও বড় নাজুক। চারিদিকে ঢেউয়ের মতো ফিতনা একটির উপর আরেকটি আছড়ে পড়ছে। এ সময়ে আলিম নামের ছদ্মবেশী কিছু লোক তাদের এই মিশন বাস্তবায়নে নেমে পড়েছে। ফলে জনসাধারণের জন্য বিষয়টি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বোপরি কঠিন এই সময়ে কিছু মানুষ নিজের আকীদা ও মানহাজকে নিরাপদ রাখতে চায়। যে-কোনো পরিস্থিতিতেই তারা নিজেদের বিশ্বাসের ব্যাপারে স্বচ্ছ থাকতে চায়। এই স্বচ্ছতার মাধ্যমেই দ্বীন সংরক্ষিত থাকবে এবং মিল্লাতের বিজয়নিশান উড্ডীন হবে।

---

[১] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৬।

[২] ইবনু কাসীর, তাফসীর, ২২২।

আল্লাহর শারীআ স্পষ্ট। তাঁর দ্বীন সংরক্ষিত। আল্লাহর দ্বীনকে হেফাজতের জন্য যে ব্যক্তি নিজের সম্মান ও শক্তিকে ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাআলা তার সম্মান ও শক্তিকে হেফাজত করবেন। তার উসিলায় আল্লাহর দ্বীন আরও কিছুদিন ধরার বুকে স্থায়ী হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের সম্মান ও শক্তিকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর দ্বীনকে ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাআলা তার সম্মান ও শক্তিকে বিলুপ্ত করে দেবেন। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন সংরক্ষিতই রয়ে যাবে। এটাই নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বক্তব্যের দাবি—

اِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ

> ‘তুমি আল্লাহর (দ্বীনকে) হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন’।[৩]

প্রত্যেকেই তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। আল্লাহই আমাদের সাহায্যকারী। তিনিই সঠিক পথের দিশারী। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক।

আবদুল আযীয তারীফি
০৪/০৩/১৪২৪ হিজরি

[৩] তিরমিযি, ২৫১৬; সহীহ।

শুরুর কথা

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব তাঁর কিতাবের শুরুতেই বলেন : **"পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। 'নাওয়াকিদুল ইসলাম' তথা ইসলাম বা ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় দশটি।"**

আল্লাহর কিতাবের অনুকরণে লেখক বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করেছেন। এ ছাড়া নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও বিভিন্ন চিঠি ও চুক্তিপত্রের শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখার বিষয়টি প্রমাণিত আছে। এ ব্যাপারে তিনি আদেশ করেছেন বলেও কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়। তবে সেগুলোর বর্ণনা (সহীহ হিসেবে) সাব্যস্ত নয়।

মুবাশশির ইবনু ইসমাঈল থেকে আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে মারফূ হিসেবে বর্ণিত আছে,

كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَهُوَ أَقْطَعُ

> 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূচনা যদি বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম দ্বারা না হয়, তবে তা অপূর্ণাঙ্গ।'[৪]

তবে এই হাদীসটি মুনকার। হাদীস-বিশারদরা এটিকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। হাদীসটি মুরসাল সূত্রে 'বিসমিল্লাহ' শব্দ ছাড়াও বর্ণিত আছে। কিন্তু সেটিও মুনকার। মূলত এ হাদীসের বর্ণনাকারী মুবাশশির ইবনু ইসমাঈল ভুল

[৪] আবূ দাউদ, ৪৮৪০; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৮৭১২।

করেছেন। তিনি 'বিসমিল্লাহ' শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম, বাকিয়্যা, খারিজা ইবনু মুসআব, শুআইব ইবনু ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবনু কাসীর, মুআফি ইবনু ইমরান, আবদুল কুদ্দূস-সহ বর্ণনাকারীদের বড় একটি দল ইমাম আওযাঈর সূত্রে বর্ণনা করেন,

كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ فَهُوَ أَقْطَعُ

'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূচনা যদি বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম দ্বারা না হয়, তবে তা অপূর্ণাঙ্গ।'[৫]

এ ছাড়া ইমাম যাইলাঈ, ইরাকি, সুয়ূতি-সহ যারা বিসমিল্লাহ শব্দে বর্ণনা করেছেন তারা ভুল করেছেন। তবে পরবর্তী যুগের কিছু হাদীস-বিশারদ বিসমিল্লাহ-যুক্ত বর্ণনাটির ক্ষেত্রে সহজতা প্রদর্শন করে একে হাসান হাদীস বলেছেন।

মোটকথা, উল্লিখিত হাদীসটি দ্বারা যে-কোনো বিষয়ের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সাব্যস্ত নয়। তবে নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিভিন্ন চিঠিপত্রের শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখার বিষয়টি সাব্যস্ত রয়েছে। ইমাম বুখারি ও মুসলিম রহিমাহুমাল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আবূ সুফইয়ান রদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণনা করেন; নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিরাকলের নিকট পত্র লিখলেন (এইভাবে)—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ إِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে রোমান সম্রাট হিরাকলের প্রতি'...[৬]

نَوَاقِضُ হলো نَاقِضٌ এর বহুবচন। نَاقِضٌ বলা হয় বিনষ্টকারী ও বাতিলকারী বস্তুকে। অর্থাৎ তা যখন কোনো বস্তুর উপর প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাকে বাতিল ও বিনষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا

[৫] আবূ দাউদ, ৪৮৪০।

[৬] বুখারি, ২৯৪১, ৬২৬০; মুসলিম, ১৭৭৩।

> ‘সেই নারীর মতো, যে বহু শ্রমের পর বোনা সুতোকে বিনষ্ট করে ফেলে।’[৭]

অর্থাৎ সে ওটাকে বিনষ্ট ও বাতিল করে দেয়। বিষয়টি ঠিক ওজুকে বাতিল ও বিনষ্টকারী বিষয়গুলোর মতো। অর্থাৎ ওজু-নষ্টকারী বিষয়গুলো যখন কোনো ব্যক্তি সম্পাদন করে তখন তার ওজু বাতিল হয়ে যায় এবং তাকে পুনরায় ওজু করতে হয়। ইসলাম-ধ্বংসকারী বিষয়গুলোও ঠিক তেমনই। যখন কোনো মানুষ এ বিষয়গুলো সম্পাদন করে তখন তার ইসলাম বাতিল ও বিনষ্ট হয়ে যায়। লেখক তাঁর গ্রন্থে এমন বিষয়গুলোকেই সংকলন করেছেন।

লেখকের বর্ণনামতে, তিনি এই বইয়ে ইসলাম-বিনষ্টকারী দশটি কারণ উল্লেখ করেছেন। আসলে ইসলাম-নষ্টকারী কারণ এর চেয়ে অনেক বেশি। আলিমগণ তাঁদের গ্রন্থাবলীতে ধর্মত্যাগ ও মুরতাদের বিধান-সম্বলিত অধ্যায়গুলোতে বহু কারণ উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে একজন মুসলিম দ্বীন থেকে বের হয়ে যায় এবং তার সম্পদ ও রক্ত হালাল হয়ে যায়। তবে লেখক এখানে সবচেয়ে বিপজ্জনক, বড় ও বহুল সংঘটিত বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। তিনি এমন বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন, যার ব্যাপারে আলিমগণ একমত।

হানাফি, মালিকি, শাফিয়ি ও হাম্বলি আলিমরা তাঁদের ফিকহের গ্রন্থাবলীতে এ বিষয়টির জন্য একটি বিশেষ অধ্যায় রচনা করেছেন। তাঁরা সেই অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন ‘ধর্মত্যাগকারী ব্যক্তির বিধান-সংক্রান্ত অধ্যায়।’ তাঁরা সেখানে ঈমান-ধ্বংসকারী বিশ্বাস, বক্তব্য ও কর্মের বিভিন্ন রূপ উল্লেখ করেছেন। ইসলাম গ্রহণের পর সে বিষয়গুলো যদি কেউ সম্পাদন করে তবে সে কাফির হয়ে যায়। যারা এ বিষয়ে বিস্তারিত অধ্যয়ন করতে চান তারা সেসব গ্রন্থাবলী দেখে নেবেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্তারিত ও সমৃদ্ধ রচনাবলী রয়েছে হানাফি ইমামদের। তাঁরা এ ক্ষেত্রে অনেক প্রকার ও ধরন উল্লেখ করেছেন।

এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা জরুরি। তা হলো, ‘ঈমান বিনষ্টকারী’ কোনো বিষয় সম্পাদন করার দ্বারাই ঈমান ভেঙে যায়। ‘ঈমান বিনষ্টকারী’ বিষয়কে হালাল মনে করা (ঈমান ভঙ্গের জন্য) আবশ্যক শর্ত নয়। নতুবা ব্যভিচার,

---

[৭] সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৯২।

মদপান, চুরি, খুন ইত্যাদিকেও ঈমান বিনষ্টকারী বলতে হয়। কারণ এগুলোর দুটি অবস্থা—যদি এগুলোকে কেউ হালাল বলে বিশ্বাস করে তা হলে সে কাফির হয়ে যায়। আর যদি হালাল বলে বিশ্বাস না করে তা হলে কাফির হয় না (অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হয়)।

উপরিউক্ত কাজগুলো (যেমন : ব্যভিচার, মদপান, চুরি, খুন ইত্যাদি) হালাল মনে করা কুফরি, যদিও সে তাতে লিপ্ত না হয়। পক্ষান্তরে ঈমান ধ্বংসকারী কাজগুলোতে লিপ্ত হওয়াই কুফরি, যদিও সে (ঈমান-বিধ্বংসী) বিষয়গুলোকে হারাম বলেই বিশ্বাস করে। তাই এগুলোকে ঈমান ধ্বংসকারী বলা অর্থহীন। বরং এগুলোকে 'হালাল মনে করা' হচ্ছে ঈমান ভঙ্গের কারণ।

সকল হারাম কাজের ক্ষেত্রে একই কথা। তবে এ বিষয়টি ব্যক্তির অজ্ঞ না-থাকা এবং বিভিন্ন শর্তাবলী ও নিয়মনীতির ক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান থাকার সাথে সম্পৃক্ত। স্বল্প পরিসরে বিষয়টি আলোচনা করা সম্ভব নয়।

ঈমান ভঙ্গের প্রথম কারণ

আল্লাহর সাথে শিরক করা

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব বলেন : **"আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরক তথা অংশীদার সাব্যস্ত করা।**

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন।'[৮]

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّـهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّـهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেবেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'[৯]

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জবাই করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন জিনের নামে বা মাজারের নামে জবাই করা।"

---

[৮] সূরা নিসা, ৪ : ৪৮।

[৯] সূরা মায়িদা, ৫ : ৭২।

শিরক হলো, আল্লাহর প্রভুত্ব ও তাঁর উপাসনার ক্ষেত্রে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা। আর তাঁর প্রভুত্বের ক্ষেত্রেই অধিকাংশ শিরক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে।

শিরক হলো আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধ। অপরাধের দৃষ্টিকোণ থেকে তা সবচেয়ে কঠিন ঈমান-বিধ্বংসী কাজ। আল্লাহ নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন যে, তিনি শিরককারীর শিরক ক্ষমা করবেন না। যদি সে তাওবা করে ফিরে আসে তবে ভিন্নকথা। শিরকের কোনো কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ নেই। শুধুমাত্র তাওবাই তার সমাধান। এ জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

> ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। তা ছাড়া সব অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন যদি তিনি ইচ্ছে করেন।’[১০]

শিরক হলো বিরাট জুলুম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَـٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

> ‘যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে কোনো জুলুমের সাথে জড়িয়ে ফেলেনি তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা। আর তারা পথপ্রাপ্ত।’[১১]

ইমাম আহমাদ, বুখারি ও মুসলিম রহিমাহুমুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো,

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَـٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

> ‘যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে কোনো জুলুমের সাথে জড়িয়ে ফেলেনি তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা। আর তারা পথপ্রাপ্ত।’

---

[১০] সূরা নিসা, ৪ : ৪৮।

[১১] সূরা আনআম, ৬ : ৮২।

ব্যাপারটি আল্লাহর রাসূলের সাহাবিদের জন্য কঠিন হয়ে গেল। তাঁরা বললেন, আমাদের মাঝে কে এমন আছে যে নিজের প্রতি জুলুম করে না? তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

لَيْسَ كَمَا تَظُنُّوْنَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

> 'তোমরা যেমনটি ধারণা করছ বিষয়টি তেমন নয়। বরং যেমনটি লুকমান তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন : ছেলে আমার, আল্লাহর সাথে শিরক কোরো না। নিশ্চয় শিরক হলো বিরাট জুলুম।'[১২]

ইমাম আহমাদ, বুখারি ও মুসলিম রহিমাহুমুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন অপরাধটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন,

أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

> 'তুমি আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করবে। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।'

আমি বললাম, নিশ্চয়ই বিষয়টি অনেক বড়।[১৩]

কেনই বা শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ, সবচেয়ে বড় জুলুম ও সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হবে না? এটা তো স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেওয়া। এটা এমন অপরাধ যার কোনো ক্ষমা নেই। এটা আল্লাহকে ছোট মনে করার নামান্তর। তাই যে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করল সে প্রকাশ্যে আল্লাহর বিরোধিতা করল। সরাসরি আল্লাহর অবাধ্য হলো। আল্লাহর সাথে শত্রুতা পোষণ করল। আল্লাহর জন্য সে এমন বিষয় সাব্যস্ত করল, যা থেকে তিনি নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। কিয়ামাত-দিবসে মুশরিকরা তাদের উপাস্যদের সাথে কেমন আচরণ করবে, আল্লাহ তা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[১২] বুখারি, ৩৩৬০; মুসলিম, ১২৪; আহমাদ, ৪০৩১।

[১৩] বুখারি, ৭৫২০; মুসলিম, ৮৬।

تَاللَّـهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

‘আল্লাহর কসম! আমরা তো সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মাঝে নিপতিত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সাদৃশ্য মনে করেছি।’[১৪]

শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম :

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّـهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّـهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

‘নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেবেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।’[১৫]

তার সকল আমল বরবাদ :

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

‘কিন্তু যদি তারা কোনো শিরক করে থাকত তা হলে তাদের সমস্ত **আমল** ধ্বংস হয়ে যেত।’[১৬]

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

‘যদি তুমি শিরক করো তা হলে অবশ্যই তোমার **আমল** বরবাদ হয়ে যাবে।’[১৭]

উপরিউক্ত আয়াতে **আমল** বলে বান্দার সকল আমলকে বোঝানো হয়েছে। শুধুমাত্র শিরকে আকবার ছাড়া অন্য কোনো অপরাধ বান্দার সকল আমলকে বরবাদ করে দেয় না।

শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির রক্ত ও সম্পদ হালাল। তবে এ ক্ষেত্রে শারীআ ‘আহলুয যিম্মা’ ও চুক্তিবদ্ধ মুশরিককে বাদ দিয়েছে,

---

[১৪] সূরা শুআরা, ২৬ : ৯৭-৯৮।
[১৫] সূরা মাইদা, ৫ : ৭২।
[১৬] সূরা আনআম, ৬ : ৮৮।
[১৭] সূরা যুমার, ৩৯ : ৬৫।

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

‘অতএব, হারাম মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে গেলে মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো এবং তাদের ধরো, ঘেরাও করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকো। তারপর যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তা হলে তাদের ছেড়ে দাও। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।’[১৮]

শিরকের প্রকারভেদ

আল্লাহ তাআলা প্রতিটি শিরক দুভাগে বিভক্ত :

১. শিরকে আকবার তথা বড় শিরক

২. শিরকে আসগর তথা ছোট শিরক

শিরকে আকবার মানুষকে মুসলিম জাতিসত্তা থেকে বহিষ্কার করে দেয়। তার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের বন্দোবস্ত করে ফেলে, যদি সে শিরক থেকে তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে। কোনো ইবাদাতকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য সাব্যস্ত করাকে শিরকে আকবার বলা হয়। যেমন, গাইরুল্লাহ, কবরবাসী ওলি, নেককার ব্যক্তি, জিন ও শয়তানের জন্য জবাই করা। কাজটি তাদের ভয়ে কিংবা ভালোবাসায় যে-কোনোভাবেই করা হোক না কেন, তা হবে শিরক। কেউ কেউ কবরবাসী, জিন ও শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচতে তাদের নামে জবাই করে। গাইরুল্লাহর কাছে তারা এমন কিছু আশা করে যা দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। আল্লাহ ছাড়া কেউ মানুষকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে না। তাঁর (ইচ্ছা) ছাড়া কেউ কাউকে উপকৃত করতে পারে না। অথচ বহু মানুষ আজ ক্ষতি থেকে বাঁচতে ও উপকার লাভ করতে নেককার লোকদের কবরের নিকট গিয়ে তাদের নামে জবাই করছে। তাদের কাছে প্রার্থনা করছে।

---

[১৮] সূরা তাওবা, ৯ : ৫।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّـهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّـهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

> 'তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে যা তাদের ক্ষতি ও উপকার কিছুই করতে পারে না। তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। আপনি বলে দিন : তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাচ্ছ, আসমান ও জমিনের মাঝে যা তিনি জানেন না?! তিনি চিরপবিত্র এবং তাদের শিরক থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।'[১৯]

শিরকে আকবার সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমান মর্যাদা দেওয়ার নামান্তর। মুশরিকরা কিয়ামাত-দিবসে তাদের উপাস্যদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে বলবে,

تَاللَّـهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

> 'আল্লাহর কসম! আমরা তো সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মাঝে নিপতিত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমান মনে করেছি।'[২০]

শিরকে আকবার হলো, সম্মান ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য জ্ঞান করা। আর সম্মান ও ভালোবাসাই হলো ইবাদাতের আত্মা।

বড় শিরকের প্রকারভেদ

বড় শিরক চার প্রকার :

১) দুআর শিরক
২) নিয়তের শিরক
৩) আনুগত্যের শিরক
৪) ভালোবাসার শিরক

---

[১৯] সূরা ইউনুস, ১০ : ১৮।
[২০] সূরা শুআরা, ২৬ : ৯৭-৯৮।

১) দুআর শিরক

বান্দা যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদাত বা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে ডাকে তখন তাকে দুআর শিরক বলে। কেউ যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহকে ডাকার মতো করে ডাকে, সে আল্লাহর সাথে শিরক করল। এই প্রকারের শিরক সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

'যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা আল্লাহকে ডাকে দ্বীনকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে মুক্তি দিয়ে স্থলে তুলে আনেন, তখন তারাই আবার শিরকে লিপ্ত হয়।'[২১]

অর্থাৎ ডাকা বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে শিরক করে। ডাকার দ্বারা যখন কারও উদ্দেশ্য হয় উপকার চাওয়া কিংবা ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া, তখন তার এই ডাকাকে বলা হয় প্রার্থনার দুআ। আর ডাকা দ্বারা যখন উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর নিকট বিনয়, আনুগত্য ও নম্রতা প্রকাশ করা, তখন এই ডাকাকে বলা হয় ইবাদাতের দুআ।

প্রার্থনার উদ্দেশ্যে দুআ হোক কিংবা ইবাদাতের উদ্দেশ্যে, কোনোভাবেই তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য করা যাবে না। কারণ দুআ হলো বড় বড় ইবাদাতের মধ্যে অন্যতম একটি মহান ইবাদাত। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তির সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

'আর যখন আমার বান্দারা আপনার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (তখন আপনি বলুন,) নিশ্চয় আমি নিকটেই। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিই, যখন সে আমাকে ডাকে।'[২২]

তিনি বান্দাকে তাঁর নিকট দুআর করার আদেশ দিয়ে বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

[২১] সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬৫।

[২২] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৬।